সিকদার আমিনুল হকের কবিতা : সত্তা ও সময়ের অভিঘাত

শামীমা আক্তার*

[সারসংক্ষেপ : সিকদার আমিনুল হক (১৯৪২–২০০৩) আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাবান কবি। *দূরের কার্নিশ* (১৯৭৫) রচনার মাধ্যমে বাংলা কাব্যভুবনে তাঁর প্রবেশ ঘটে। প্রায় চার দশক ধরে তিনি কাব্যচর্চার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যকে ঋদ্ধ করেন। কবি পরিচয়ের পাশাপাশি তাঁর আর একটি কৃতিত্ব হলো তিনি ছয়ের দশকে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্যপত্রিকা *স্বাক্ষর*-এর (১৯৬৩) প্রথম সংখ্যার (কবি রফিক আজাদের সঙ্গে যৌথভাবে) সম্পাদক। আধুনিক জীবনঅন্বেষার বহুমাত্রিক দিকগুলো তাঁর কবিতার ক্যানভাসে চিত্রিত হয় নান্দনিক বোধের সুষমায়। সময় ও প্রতিবেশের প্রতিন্যাসে ব্যক্তির অন্তর্লোক ও বহির্লোকের নানাবিধ সংকটএষণা তাঁর কবিতার বিষয়রূপে অন্বিষ্ট হয়। তাই তাঁর কবিতার প্রধান উৎসমুখ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়– সময়ের পরিক্রমায় সত্তার অভিঘাতের মতো প্রবল সংবেদময় অনুষঙ্গকে। সুতরাং, সত্তা ও সময়ের স্বরূপ-এষণা কীভাবে তাঁর নন্দনবীক্ষার জটিলভাষ্যে পরিণত হয়ে কবিতায় প্রকাশ পায়– এ নিবন্ধ তারই বিশ্লেষণপ্রয়াস।]

সিকদার আমিনুল হক (১৯৪২–২০০৩) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কবি। এ আধুনিকতা অর্জনের পথে তাঁর স্বীয় প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞানের সঙ্গে বাংলা কবিতা ও বিশ্বকবিতার অতীত-বর্তমান প্রবণতা করায়ত্ত হয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায়। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস, ঐতিহ্য, দর্শন, সংস্কৃতি এবং সময় তাঁর কবিতার রূপকল্প নির্মাণ করে। এ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় 'কল্লোল যুগ' (১৯২৩), 'শ্রুতি আন্দোলন' (১৯৬০) কিংবা 'স্যাড জেনারেশনে'র (১৯৬০) কবিদের প্রজ্ঞা ও মনন যেমন মুখ্য তেমনি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শিল্প-আন্দোলন ও দার্শনিক অভিজ্ঞান প্রাসঙ্গিক। বাংলা কাব্যধারার প্রাচীন কবি কাহ্নপা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) থেকে শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) কিংবা শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬) পর্যন্ত বাংলা কাব্য-ঐতিহ্যের যে ধারা চলে এসেছে সিকদার আমিনুল হক সে কাব্যঐতিহ্যের ফসল। কাব্যাঙ্গনে তাঁর কবিতা বিচ্ছিন্ন ধারায় সংযুক্ত হয় না। ঐতিহ্য অভিমুখে অবস্থান করে সিকদার আমিনুল হক অন্তর্লোকের প্রজ্ঞান তথা অস্মিতার চর্চা করেন। কবি হয়ে ওঠার জন্য জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) যে 'অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা' (জীবনানন্দ, ২০১১ : ৭) আবশ্যক মনে করেন সে সারবত্তার সঙ্গে সিকদার আমিনুল হকের বোধ ও মননের অভিজ্ঞানকে অন্বিত করা যায়। এ স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানের জন্যই তিনি বাংলা কাব্য-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী কবিদের থেকে পৃথক হয়ে যান। বাংলা কবিতায় অনুরণিত হয় তাঁর নিজস্ব স্বরগ্রাম। আত্মভাষ্যের অন্তরালে কবিতায় পরিস্ফূট হয় সময়চেতনা ও বিশ্বজনীনতা। কবিতায় বর্ণিত অহমের অন্তর্বয়নে প্রতিভাত হয় কবির মানবিক বিকলন। এ মানবিক বিকলনের উন্মেষ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কালে ঘটে এবং এর ভয়াবহতা আর তীব্রতর হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। বাংলা কবিতায়ও মহাযুদ্ধের বিরূপ প্রভাব পড়ে। সুতরাং সিকদার আমিনুল হকের

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

কবিতার পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা প্রসঙ্গে সমকালীন আর্থ-সামাজিকসহ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সামূহিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সময় এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বিরূপ প্রভাব সিকদার আমিনুল হকের মানসগহনকে জটিল এবং বিভ্রান্ত করে, ফলে তাঁর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় মানবিক বিকলনের তীব্রতা। এ বিকলন তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিজাত। পারিপার্শ্বিক সময় ত্রিশের কবিদের যেমন অব্যবহিত পূর্বের কবিদের রোমান্টিক মনন, সত্য-সুন্দর ও শাশ্বতের প্রতি প্রণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে সরিয়ে এনে জটিল আবর্তের জালে জড়িয়ে রাখে, তেমনি সিকদার আমিনুল হকের আমিত্বকে করে ক্লিষ্ট, দীর্ণ আর পীড়িত। নিজের আমিত্বকে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তিনি উচ্ছ্বসিত হতে পারেন না, বরং বেদনায় আর্দ্র হন। এভাবেই পূর্বসূরি কবিদের থেকে তাঁর বোধের রূপান্তর ঘটে।

২.

সিকদার আমিনুল হক সংবেদনশীল কবি। তাঁর সংবেদনশীলতার দৃষ্টিনিয়নদীপে উন্মোচিত হয় দেশ, কাল, প্রতিবেশসহ বাস্তবপরিপার্শ্ব ও দৃশ্যপরম্পরার বৈসাদৃশ্য, প্রতিকূলতা অভিঘাত এবং ব্যক্তিলোকের সংকট, সংগ্রাম ও প্রত্যয়। কবিতায় আত্মঅস্মিতা[১] ও আত্মসন্ধানের নিরন্তর নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি বিশ্বলোকের সঙ্গে একাত্ম হন। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে জগৎস্থিত সত্তার সংযোগসাধন ঘটে। সময়ের পরিক্রমায় দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতিতে আত্মসামগ্রের চিহ্ন অর্পিত করার অনিবার্য প্রয়োজনে তাঁকে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠতে হয়। তবে তাঁর অস্তিত্ব চিহ্নিত হওয়ার পথ সহজসাধ্য নয়। বিশ্বলয়ের নানা ঘটনার সমাবেশ, সভ্যতার প্রহসন, রাজনীতির পরিহাস, সময়ের সংঘাত, স্নায়ুযুদ্ধের বিকারসহ দৈশিক নানা সংকট ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় তিনি প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হন। ফলে তাঁর শব্দপ্রকল্পনায় একই সঙ্গে মূর্ত হয় আত্মপ্রীতি ও অসহায়তার দীর্ঘশ্বাস। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে কণ্ঠলগ্ন করে, নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে দ্বন্দ্বমুখর পরিপার্শ্বকে দৃষ্টিভূত করে তিনি সমর্পিত হন কামগন্ধময় প্রেমে। সে প্রেম কোনোরূপ যৌথতার দ্যোতক নয়; তা আত্মউপভোগ ও আত্মপ্রসাদের মাধ্যম। ফলে তাঁর প্রেম, কিংবা প্রেয়সীকে নিয়ে তিনি 'আমরা' হতে পারেন না, আত্মবৈপরীত্যে তাঁর অবস্থান থাকে। সত্তার[২] নিঃসঙ্গতা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে কোনো ঐক্যবিধায়ক শৃঙ্খল রচিত হয় না, নিরন্তর সংঘর্ষ ও বিচ্ছিন্নতায় চূর্ণবিচূর্ণ হয় তাঁর মানসগহন। মার্টিন হাইডেগার (Heidegger, 1889: 1976) বর্ণিত স্বকীয় সত্তার সঙ্গে কবি জগৎস্থিত সত্তার সম্মিলন ঘটাতে প্রয়াসী হলেও তিনি কবিতায় অভিপ্সীত মুক্তিবার্তা রচনা করতে ব্যর্থ হন। তাঁর সত্তার প্রকৃত রূপ অভিব্যক্ত হয় কালিকতায় বা সময়ের ফ্রেমে। কবিতায় বর্তমানতার উপস্থিতি প্রাধান্য পেলেও অতীত ও ভবিষ্যত অঙ্গীভূত হয়। সমস্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার রূপকল্প নির্মাণ করেও তিনি ভবিষ্যত সম্ভাবনার জয়গান করেন, বেঁচে থাকার অপরিমেয় শক্তিতে বিশ্বাস রাখেন। কবিতায় উৎকলিত হয় তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত ধ্বনি : 'ষাঁড়ের সঙ্গে যে লড়াই করে, তার চেয়েও কি কম মহৎ ও সাহসী যে শুধুই বেঁচে থাকে? ...যার পোশাক শত ছিন্ন, আর রাত্রিবেলা যার কোন পানীয় নেই' ('প্রতিভা এক বিশাল বৃত্ত' : *সতত ডানার মানুষ*)।

৩.

সিকদার আমিনুল হকের কবিতার বিষয়ীতে পরিদৃশ্যমান হয় দুই সংকট : সত্তার দ্বন্দ্বমুখর সংকট এবং সত্তার সঙ্গে সময়ের সংকট। জীবনের মৌল অনুভূতি–উপলব্ধিকে বাঙ্ময় করে কবির ব্যক্তিচৈতন্যের জটিলতাকে চেতনালোকে আনার প্রয়াসে, অনুভূতিঋদ্ধ প্রজ্ঞাকে কবিতায় স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয় সংকট। স্বভাবজাত বিজনবাসী কবির নিভৃত ও নিঃসঙ্গ বসবাস এবং বুর্জোয়া সমাজপিষ্ট চিন্তাধারায় আক্রান্ত মানসলোক থেকে তাঁর একাকিত্ববোধ জাগ্রত হয়। এ একাকিত্ববোধ থেকে তাঁর অর্ন্তলোকে আত্মসন্ধানের স্বরূপ জাগ্রত হয় যার মধ্য দিয়ে তাঁর সত্তার পরিক্রমণ ঘটে। কবির এ সত্তা তাঁর ব্যক্তিসত্তা বা ক্ষুদ্রসত্তা। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (being-in-itself) সত্তার বাসনা, প্রত্যাশা ও বোধের স্পর্শে তাঁর ভেতর জাগ্রত হয় সার্বিক সত্তার (being-in-the-world), যা তাঁকে অস্তিত্বমুখী করে তোলে। আহমদ রফিকের চিন্তায় কবিতায় এই অস্তিত্বঅভীপ্সু সত্তার স্বরূপ :

> মানব অস্তিত্ব অর্থাৎ তার বোধের অস্তিত্ব, উচ্চস্নায়বিক সত্তা নির্ভর অস্তিত্ব আবেগ ও তার প্রতিক্রিয়ায় সমশাসনে স্থিত। যেমন বস্তুর প্রান্তিক অস্তিত্ব ও তার সংবেদধর্মী উপস্থিতির কারণে নিঃসৃত সংবেদ বার্তা দেহের উচ্চস্তরে গ্রহণ ও স্বীকৃত হয়ে থাকে। সে প্রতিক্রিয়ার দ্বিমাত্রিক অস্তিত্বই জীব ও জীবনকে পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে বা দ্বন্দ্বে ও সহমর্মিতায় সমন্বয়ের পথ ধরে বাঁচতে শেখায়। অস্তিত্বরক্ষায় আবেগ (উদ্দীপনা) ও মননশীলতার (উচ্চস্নায়ুকোষের ভাবনা) সমন্বয় তাই সত্তা বা অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত। এটা জীবনের জন্য স্বীকৃত শারীরতাত্ত্বিক সত্য। (আহমদ, ২০০১ : ২৪৫)

সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় সত্তা প্রটাগনিস্টের (Protagonist) ভূমিকা পালন করে। কবির অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিসত্তা সংবেদনশীল কল্পনার মনোপ্রতিন্যাসে কবিসত্তা হয়ে ওঠে অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ব্যক্তি সিকদার আমিনুল হক কবি-ব্যক্তিতে পরিণত হন। কবি হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন : 'কবিতা সবার জন্যে নয়। এক ধরনের অনুভূতি-শীলদের জন্যে, যাঁদের হৃদয়ী সংক্রাম তীব্র, যাঁদের সংবেদন শততল, যাঁদের মৌলপ্রতিন্যাস কল্পনাভরা' (মান্নান, ২০১০ : ৩৩২)। তীব্র সংবেদনশীলতা তাঁর মানসলোকে প্রতিবিম্বিত হয়ে শিল্পকৌশলের নির্দিষ্ট বিন্যাসে বাক্‌মণ্ডিত হয়ে ওঠে। একাকিত্বের সুরের মাধ্যমে কবিতায় তাঁর স্বরান্যাস ঘটে :

আহত হৃদয় একা, করপুট ধরে থাকে একা
শোকার্ত গৃহের কাছে নিরাশ্রয় জটিল লণ্ঠন।
শিকড় নেমেছে একা, জল যায়, সেও বুঝি একা
আহত হৃদয় ঢাকা, জরায়ুর কবোষ্ণ জীবন।
প্রণতিপাতের জন্যে ধরে থাকা নিজস্ব আঙুল
ভেঙেছে ঘরের বাহু, তেলজল, মন্দির প্রতিমা
আহত হৃদয় জানে, অপমানে অবিমৃষ্য ভুল
বুক জলে একা হও, করপুট ধরে আছে ক্ষমা।
('একা' : দূরের কার্নিশ)

কবি যে স্বকীয় সত্তার (being-in-itself) কথা বলেন বিচ্ছিন্নতার সূত্রে তার অবস্থান। সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনবিন্যাস থেকে তাঁর অবস্থান দূরে। বিশ্বসংসার তাঁর দৃষ্টিলোকে অবস্থান করে সংযোগহীনতার দূরান্বয়ে; বৃক্ষ, শিকড় ও জলের মধ্যে তিনি কোনো অন্বয় খুঁজে পান না। বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্য তাঁর অভিজ্ঞানে প্রতিভাত হয়। জীবনকে মহৎ না করে ক্ষুদ্রত্বের

পরিসীমায় চিহ্নিত হয়, প্রার্থনা বা সমর্পিত বিশ্বাস ধ্বংসের উপকরণরূপে বিবেচিত হয়। প্রণতিপাতের জন্য ধরে থাকা আঙুল তাঁর ঘরের বাহু, তেলজলসহ মন্দির প্রতিমাকেই বিনাশ করে। তিনি যে ধ্বংসযজ্ঞ ও বৈপরীত্যকে প্রত্যক্ষ করেন তাঁর উৎস কেবল বাহ্যিক নয়, অভ্যন্তরীণও। ঘরের বাহু, তেলজল, মন্দির প্রতিমার প্রতীকে বিবেচনা করা যায় তাঁর আশ্রয়, জীবনযাপনের উপকরণ ও সমর্পিত বিশ্বাস যা ধসে পড়ে পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের আঘাতের পরিবর্তে তাঁর নিজস্ব সংঘাতে। সত্তার অন্তরীণ অভিঘাত এখানেই সুস্পষ্ট। এই অভিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়েই তিনি আত্মবিশ্লেষণে প্রয়াসী হন। সেখানে আহত হৃদয়ের পাশে তিনি ত্রস্ত হৃদয়ের উপস্থিতি লক্ষ করেন যারা তাঁর অন্তর্লোকে সহচররূপে অবস্থান করে। তাঁদের পারস্পরিক বোঝাপড়া কবিতায় সমাসোক্তি হয়ে ওঠে : 'আহত হৃদয় জানে ত্রস্ত হৃদয়ের ক্ষয়ক্ষতি' ('আমাকে ব্রতী করো ক্ষমায় কিংবা অবিশ্বাসে' : *দূরের কার্নিশ*)।

সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় ব্যক্তিসত্তা পূর্ণতাপ্রাপ্তির পরিবর্তে অসংখ্য খণ্ডিত সত্তায় পরিণত হয়। মানুষকে অখণ্ড পরিসরে পর্যালোচনার পরিবর্তে তিনি বহুভঙ্গিমতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের জটিল সীমায় বিশ্লেষণ করেন। মনের বিচিত্র ইচ্ছা, অনুভূতি, লোভ-কাম, বাসনা-নগ্নতা প্রভৃতির আবর্তে আধুনিক নাগরিক জীবনের চৈতন্যকে তিনি বাক্‌মণ্ডিত করেন :

> শহরে ঢুকেছি তা অনেক দিন! –আমি একা নয়, সাথে
> ভয়, স্বার্থপর চিন্তা। একখণ্ড সহিষ্ণুতা ছিলো
> আজ আর সাথে নেই; গির্জা-ঘরে তাকে পাওয়া যাবে,
> কিছুটা বেশ্যার ঘরে, ...একখণ্ড রক্তময় গামলায়–
> কিছু চলে গ্যাছে হয় সাবানের জলে, না হলে কমোডে;
> সম্পূর্ণ যায় না উড়ে প্রতিভার। পেট্রোলের গন্ধ
> তেল, ইস্তিরি-করা শার্ট, ফুটপাথ, কবিতার ক্লাস...
> এভাবে খণ্ডিত হয়ে মিশে গেছি মানুষের দলে।
> একটি খণ্ডের কর্তা ভালোবাসা। সেই অনুভূতি
> তুলে দিই তাকে, যার স্তন ফরসা, নিতম্বের রং
> চন্দন কাঠের মতো, ঠাণ্ডা উরু দেখতে পিতল।
> হরিণের জন্যে কোনো খণ্ড নেই, কেননা নগরে
> কোন হ্রদ নেই; আছে পাতকুয়া। চৌবাচ্চার জল।
> যে- খণ্ড ধর্মের ছিলো, মাঝে মাঝে তাকে খুলে দেখি।
>
> ('শহরে ঢোকার দিন' : *লোর্কাকে যেদিন ওরা নিয়ে গেলো*)

মানবস্বভাবের বহুমুখী প্রবণতাকে কবি নির্মোহ চিত্তে শব্দে ধারণ করেন যেখানে মানবমনের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যক্তি বলে নির্ণীত হয়। মানবস্বভাবের হিংস্রতা, পাশবিকতা, জটিলতা-নমনীয়তাকে তিনি বৈপরীত্যের (binary opposition) মাধ্যমে তুলে আনেন। সুন্দর ও মঙ্গলময়তার অভীপ্সু যে সহিষ্ণু হৃদয়, সেই হৃদয়ই একই সঙ্গে হয়ে ওঠে নির্মম, পাশবিক। কবি গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি থেকে পর্যালোচনা করেন মানবভ্রূণ হত্যার নৃশংসতা। সাবানের জলে ধুয়ে ফেলার মাধ্যমে একখণ্ড রক্তের অস্তিত্ব লীন হয়ে যায়। এই মানবসত্তাই আবার খণ্ডিত হয়ে মিশে যায় শ্রমজীবী মানুষের দলে। তবে তা কোনো মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নয়। মানবহৃদয়ের খণ্ডিত এক অংশের অধিকর্তা ভালোবাসা। এ ভালোবাসার প্রয়োজনে ব্যক্তির যে সঙ্গলিপ্সা তার মধ্যেও নিহিত থাকে আত্মপ্রীতি : মানুষ যখন অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সেটাও আত্মপ্রীতির মর্ম থেকে উৎসারিত। সঙ্গলিপ্সা কোনো সামাজিক দায়বোধ

কিংবা মানসিক চাহিদা থেকে উদ্ভূত হয় না আধুনিক মানুষের। আধুনিক মানুষ অস্তিত্বের আহ্বান থেকেই সকল কিছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তির আত্মলীলা তথা তার অস্তিত্বমানতার বিচরণ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। ভাষাই এক অর্থে তাকে অস্তিত্বশীল করে তোলে। এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায় মানস চৌধুরী রচিত 'সম্পর্ক : নিরন্তর আত্মকে খোঁজা, এমনকি আত্মোৎসব' প্রবন্ধের অংশবিশেষ :

> আমরা উচ্চারণ করি, তাই আমরা সম্পর্কিত। আমরা পরস্পর ভাষালীলা করি, তাই আমরা সম্পর্কিত। আমার ভাষার শরীরে আপনি স্থান পান, তাই আমরা সম্পর্কিত। আমার ভাষা পরিশেষে আমারই এক উৎসব, তাও আমরা সম্পর্কিত। আমার অনুপস্থিতি এই উৎসবকে অনস্তিত্বমান করে তোলে। এই আমার স্বার্থ। [সেলিম (সম্পা.), ২০১৫ : ৭২]

আত্মতৃপ্তির বাসনায় আধুনিক মানবপ্রকৃতির নিরন্তর বিচ্ছিন্ন ছুটে চলায় তার মধ্যে অসহায়ত্ব প্রবল হয়ে ওঠে। অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠার তীব্র অভীপ্সা তাকে বিপন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। ফলে তাকে নিমজ্জিত হতে হয় উদ্বেগে। অস্তিত্বশীল সংগ্রামী মানবসত্তা তখন নিরাপত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করে অচেতনে :

মাঝরাতে অনিদ্রার আতঙ্কে পিতাকে মনে পড়ে।
যখন থাকে না ঘরে মিহি সরোদের ঘ্রাণময়
ভৈরবীর মুগ্ধ বেশ, ঝাড়বাতি প্রায় নিবু নিবু,
থাকে না ডিস্কোর হল্লা রাত্রিব্যাপী মদ্যপ আসরে
মনে পড়ে তাঁর মুখ। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের রং
পিতার গর্বিত স্কন্ধে।...
বস্তুত আমার সত্তা প্রিয়তম পিতা। তাকে ছাড়া
অন্ধ হয় স্বরলিপি, চৈতন্যের তন্তু ছিঁড়ে যায়;
খাবারে আসে না স্বাদ ভোজ্যবস্তু সব উগ্রতায়
সারাদিন কষ্ট দেয় পাকযন্ত্রে। কেননা পিতার
বিশুষ্ক ওষ্ঠের কথা মনে পড়ে। হয়তো তৃষ্ণার
ঠোঁটে জলবিন্দু চেয়ে তুমুল কাতর তিনি আজ।

('প্রিয় পিতাকে' : *আমি সেই ইলেকট্রা*)

আধুনিক বিলাসবহুল ও সজ্জিত পরিপার্শ্বে বিচরণ করেও কবিসত্তার উদ্বেগ কমানোর প্রয়োজনে পিতৃসত্তার আশ্রয় কাম্য। অন্ধকারবেষ্টিত রাত মানবমনের অচেতনজগৎকে নির্দেশ করে। মনের অচেতন স্তর উৎকণ্ঠা অতিক্রম করতে পিতৃপ্রত্নকল্প (father archetype) কবিতায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এ পিতৃপ্রত্ন ইডিপাস কমপ্লেক্স তৈরি করে না, তা সত্তার আশ্রয়ের; তার পথনির্দেশকের ভূমিকায় অবস্থান করে। এ স্তরে পৌঁছাতে কবির চৈতন্যের তন্তু অতিক্রম করতে হয়। কবি পিতৃসত্তার নিকটবর্তী হতে পারেন না। পিতা মূল্যবোধের প্রতীক এবং তিনি নিজেই আজ তৃষিত। তাই কবির অস্থির সত্তা পরিতৃপ্ত না হয়ে বরং পরিবর্তিত হতে থাকে। কেননা :

> আমরা নিঃশেষ না হয়ে পরিবর্তিত হই, যতদিন আমরা জীবিত থাকি, প্রতি মুহূর্তেই আমাদের পরিবর্তন আসে, কিন্তু আমাদের অস্তিত্বে সর্বক্ষণ একইভাবে জড়িত থাকে সময় এবং স্মরণ। আধুনিক সাহিত্যিক তাই ঘটনা, চিন্তা এবং আবেগের স্রোতোধারায় চরিত্রের জীবন নির্মাণ করেন। (আহসান, ২০০১ : ১০১)

সত্তার পরিবর্তন, তার গতিপ্রবাহের বাঁকবদলের সঙ্গে ব্যক্তির অভিরুচি, বোধ ও ভালোলাগার সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তির প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের নেপথ্যে ক্রিয়া করে তাঁর অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান হতে আহরিত বোধ, ফলে তার উপলব্ধির পার্থক্য সূচিত হয় :

পায়ের কাছে অভ্র মেলে দাঁড়াতে শিখলো বলে
ওকে আমার ভালো লাগে,
.... তখন আলিঙ্গন
ওকে আমি লিখতে বলি ধূর্ত যূথিকা
কিন্তু শরীর থেকে শরীর থেকে–
ক্রমশ যেন বাড়তে থাকে ব্যতিক্রমী ভিড়!
পায়ের কাছে অভ্র মেলে দাঁড়াতে শিখলো বলে
ওকে আমার ঘৃণ্য লাগে,
যখন আমার মাংস থেকে খুবলে নেয় ব্রাত্য শীর্ণতা
আমার তখন ভালো লাগে একলা থাকার দারুণ উচ্চতায়!

('অভ্র মেলে দাঁড়ায় বলে' : *দূরের কার্নিশ*)

কবিমানসের সংঘাতময় চিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কিত হয় এখানে। যে কারণে কোনো কিছু তার মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা ঠিক সেই একই কারণ তার মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। কাছে টানতে গিয়েও বৈপরীত্যের আকর্ষণে ব্যতিক্রমের চিহ্ন পরিদৃশ্যমান হয়। সৃষ্টি হয় সম্পর্কের জটিলতা। এ সংকটের নেপথ্যে কবির পরিবর্তমান সত্তা ক্রিয়া করে এবং আত্মসত্তা তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সার্বিকসত্তায় পরিণত হয় এবং তার জটিলতার চূড়ান্ত রূপ মূর্ত হয় সময়ের প্রতিঘাতে।

৪.

নিরবচ্ছিন্ন কালপ্রবাহের (temporality) সঙ্গে জগৎস্থিত ব্যক্তিজীবনের অনাগত মুহূর্তগুলো (এখনগুলো) বর্তমানের ভেতর দিয়ে নিয়তই অতীত হয়ে যাচ্ছে। জন্মের অর্থাৎ সমস্যাপূর্ণ জগতে নিক্ষিপ্ত হবার পর মুহূর্ত থেকে প্রতিটি মানুষের জীবন কালস্রোতে ভেসে চলে শেষ পরিণতির দিকে (নূরনবী, ২০০৬ : ৬৫)। জগৎসংসার সম্পর্কে দায়িত্ববোধ থেকে আসে উদ্বেগ এবং সেখান থেকে সূচনা ঘটে মানব অস্তিত্বের গল্প :

এক বিশেষ দিন, ভূতলবাসীর জন্য প্রেরিত এক ছোট্ট তুলতুলে
খরগোশ। অথচ বন বহুদূরে,
স্তূপাকার আপেলের উজ্জ্বল গাঢ় রঙের বিপরীত এই পর্বত।
ফাঁকা, ভীষণ ফাঁকা এক টেবিলে, কদাকার টেবিলে এই
ঝোড়ো গল্প, সমুদ্রের গল্প। এবং আমাদের গল্প।
দেখছি চার দেয়াল, লণ্ঠনের আলো, খাঁ-খাঁ বিশালতা এক
উলঙ্গ সময়। তার সামনে বধির ও শোভন ঠাণ্ডা
এই চিত্র। সময়ের চিত্র।

('স্বপ্নহীন খঞ্জ' : *বহুদিন উপেক্ষায় বহুদিন অন্ধকারে*)

কবির দৃষ্টিলোকে আবর্তিত হয় নগ্ন সময় ও সময়ের স্থির চিত্র। সময়কে আবাহন করে নির্মিত হয় জীবনের গল্প, মানুষের স্বপ্নকল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা ও প্রত্যয়।

একেকটা দিন ছোট্ট তুলতুলে খরগোশের মতো প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল, অনেক সম্ভাবনা নিহিত থাকে তার ভেতর। মহাসময় থেকে আবর্তিত প্রতিটি দিনকে তিনি বহুদূরের বন থেকে বেরিয়ে আসা একটি ছোট্ট খরগোশের রূপকল্পনায় বাক্‌ময়িত করেন। সমস্যাসংকুল জীবন-জটিলতা ও চারপাশের অসীম শূন্যতার চিত্রাঙ্কন করেন কবি 'ফাঁকা, ভীষণ ফাঁকা এক টেবিল', 'খাঁ-খাঁ বিশালতা' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের সমন্বয়ে। অসীম শূন্যতার মধ্যেও ব্যক্তির অস্তিত্ববান হওয়ার ইঙ্গিত নিহিত থাকে লণ্ঠনের আলোর প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। প্রতিটি বর্তমান সময় যেমন কবির জীবনে প্রতিনিয়ত অতীতে পরিণত হয়, সময়ের সঙ্গে সক্রিয় হতে না পারার বেদনায় নিজেকে খঞ্জ বলে মনে হয়; তেমনি তিনি বর্তমান সময়ে অবস্থান করে তিনি অতীতের পদধ্বনির স্পর্শ পান। 'ভূগর্ভস্থ সুপ্রাচীন শব্দ স্বচ্ছন্দে হাঁটছে। হাঁটছে মানুষ' বাক্যবন্ধের উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি মহাসময়ের কালপ্রবাহের মধ্য দিয়ে মানুষের পদচারণা তথা সভ্যতার অগ্রযাত্রায় যদিও সবসময় শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না, 'শান্তি বিবর্জিত' মানুষের পদচিহ্নে কলুষ হয় ভূগর্ভ। বহু স্থূলকায় শতাব্দীতে কবি চৌকশ অভিনেতার মতো বিচরণ করেন যেখানে তার অস্তিত্বের বন্দনা করতে দিনরাত্রি আসে, শহরের বুকেও আসে বসন্ত।

৫.

সময়ের পরিক্রমায় সত্তা পরিবর্তিত হয়। সময় বিমূর্ত হলেও প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাওয়া ঘটনার মাধ্যমে সময়ের অনিবার্যতা মূর্ত হয় সত্তায় এবং প্রতি সেকেন্ডে পরিবর্তিত সত্তা অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। চলমান সময়ের আবর্তে ঘটে যাওয়া বহুবিধ ঘটনা সংবেদনশীল কবিসত্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সিকদার আমিনুল হকের বোধ ও প্রজ্ঞার সঙ্গে অন্তর্জালে জড়ানো থাকে প্রবহমান সময়। 'প্রযুক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উৎকর্ষ, বিশ্বায়নের টান, ব্যক্তি ও তার নিজ স্পেসটিকে টুকরো করে ফেলার ক্ষমতায়নধর্মী রাজনৈতিক সংস্কৃতি, পণ্যমোহমেঘ কবিতাকেই অন্তর্নিঃসহায় করে তুলেছে' (আকতার, ২০১৪ : ১৪)। কবির মানসবিবর্তনে দেশের আর্থরাজনৈতিক পরিস্থিতিও অনেকাংশেই দায়ী :

> বাংলাদেশের সত্তরের দশক ছিল রাজনৈতিক তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্মমতা-ভয়াবহতা অতিক্রম করে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। সমাজগভীরে এ সবের বিধ্বংসী প্রভাব ও নয়া স্তরবিন্যাস, শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, মূল্যবোধে ধস, অর্থনৈতিক বিপর্যয় (খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ভোগ্যপণ্যের স্বল্পতা ইত্যাদি তো ছিলই) এবং অনুরূপ ঘটনার সমবায় সার্বিক পরিস্থিতিকে অস্থির ও দূষিত করে তোলে। তাছাড়া রাজনৈতিক অঙ্গনে সন্ত্রাস ও মতাদর্শভিত্তিক সংঘাত তো ছিলই।...
>
> এই সাধারণ প্রভাব ছাড়াও সুনির্দিষ্টভাবে ঐ দশকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে বিশৃংখলা নতুন রূপ নেয়। নয়া চরিত্রের সংঘাত ও ভাঙনের রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতিতে ছায়া ফেলে। পাকিস্তানি রাজনীতির ধারায় সামরিক শাসন ও বেসামরিক সমর চরিত্রের শাসন উর্দিপরিহিত ও উর্দিবিহীন অবস্থাতেও সামাজিক সুস্থিরতা পুরোপুরি উদ্ধারে সহায় হয়নি। রাজনৈতিক অন্তর্কলহের পথ ধরে পঁচাত্তরের পরও সমাজে দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা প্রধান হয়ে থাকে। সমরকর্তাদের শাসন ও ক্ষমতার লোভ শুধু রক্তক্ষয়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয়, অনাচারের আগলও খুলে দেয়। ক্ষমতা হয়ে ওঠে বিকিকিনির খেলা। (আহমদ, ২০০৭ : ২১৭)

সাত ও আটের দশকে সমাজচত্বর ও জীবনযাপনের নিত্যপ্রবাহে থাকে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার ছাপ। যে জীবন ও সময়কে বাংলাদেশের মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় তা

যেমন ভঙ্গুর তেমনি ক্ষয়িষ্ণু। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিসহ রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক নিষ্পেষণে ব্যক্তিজীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। ব্যক্তিকে রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার ব্যবস্থার বলি হতে হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা[৩], কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়ার অঙ্গীকার থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং স্বাধীনতা অর্জনের এক দশকের মধ্যেই যে নৈরাজ্য দেখা দেয় তাতে দেশের সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশ ও তার সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়। স্বাধীনতা লাভের পাঁচ বছরের মধ্যেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা থেকে শুরু করে হয় সামরিক অভ্যুত্থান, যা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে সংশয়গ্রস্ত করে :

> ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যের হাতে তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) পরিবারের উপস্থিত সব সদস্যের সঙ্গে নিহত হন। এরপর দেশে প্রায় ২০টি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ...স্বাধীনতা অর্জনের পাঁচ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ যেসব ভয়াবহ ঘটনা-দুর্ঘটনার শিকার হয়, তাতে অনেকের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে দেশটি টেকে কি না। (হাবিবুর, ২০১৩ : ১০)

সংবেদনশীল কবি সিকদার আমিনুল হকের মানসে সময়ের প্রতিকূল প্রবাহের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। প্রতিদিনের বাস্তব জীবনেই কেবল শঙ্কা আর অনিশ্চয়তা বিরাজ করে না, তাঁর স্মৃতি ও স্বপ্নেও উদ্বেগ আর ভীতি সক্রিয় থাকে। পৌরাণিক চরিত্র ইলেকট্রার যন্ত্রণার সঙ্গে তাঁর দগ্ধ হৃদয়ের যন্ত্রণার প্রতিতুলনা করা যায়। দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে নেতার জন্য শোকসন্তাপ নয়, তিনি একজন পিতাহারা কন্যার হৃদয় নিয়ে শোকাতুর অবস্থায় আর্তনাদ করেন পিতার জন্য :

> স্মৃতির দুঃসহ দিন, নেকড়ের সন্ত্রাসের রাত্রি
> কতকাল থেকে নেমে এলো এই শ্রাবণের ধারা।
> আমার কৃতঘ্ন দেশ ভুলে গেছে হননের কথা
> এই বুঝি হয় অপঘাতে মৃত্যু আর জীবনের হার।
> ...আমার নিভৃত স্তরে স্তরে
> আসে শৈশবের স্মৃতি, মনে পড়ে একান্ত পিতাকে;
> স্বদেশের নেতা নয়, শুধুই পিতা, কন্যার কবিতা।
> ('আমি সেই ইলেকট্রা' : *আমি সেই ইলেকট্রা*)

পিতৃহারা কন্যাসদৃশ কবির অনুভবের অন্তরবিক্ষেপে জাগে অন্তর্লীন বেদনা। বর্তমান সময়ে অবস্থান করে তিনি স্মৃতিচারণা করেন। কবির অন্তরিন্দ্রিয়ের সুরসাম্যে ধ্বনিত হয় শৈশবের স্মৃতি। যা কবিতায় গূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি রাষ্ট্রের জন্মপূর্ব সময় থেকে জন্মলগ্ন ও তৎসংলগ্ন সময়ের নিবিড় পরিচর্যা, নেতৃত্ব প্রদানকে কবির নিকট পিতৃত্ব বলে প্রতিভাত হয়। রাষ্ট্রের কৃতঘ্নতায় কবি ক্ষুব্ধ, কবিতার বাইরে যেহেতু তাঁর কিছু করা অসম্ভব তাই কবিতায় তিনি গান গেয়ে যান 'সজল মেঘমল্লার, রক্তে ভেজা শোকার্ত দরদে'। কবিসত্তার সংকটের কারণ তা সময়ের নির্মম পরিণতিতে কবিসত্তা অশ্রুসিক্ত, ক্লান্ত। পিতাকন্যার স্মৃতিচারণায় জাতীয় জীবনের মহাসংকট, চিন্তার অবক্ষয় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় উঠে আসে। এভাবে কবির ভাবকল্পনা কাল-প্রভাবিত হয়ে কালোত্তীর্ণে উন্নীত হয়। কারণ কালচিহ্নিত জীবনের বোধ-প্রজ্ঞা কবির ভাবকল্পনায় পুঞ্জীভূত হয়। এ প্রসঙ্গে সনৎকুমার সাহার মন্তব্য স্মরণীয় :

> কালচিহ্নিত জীবন সমাজ-সংসারের ঘূর্ণাবর্তে বোধের বা অনুভবের যে বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকে, তাকে ঠিক ঠিক চিনে নিয়ে ভাব-কল্পনায় আকার দেওয়া কোনো সৎকবির একান্ত অপরিহার্য

> দায়িত্ব। ওই সব বিচ্ছুরণে কালের প্ররোচনা মিশে থাকে অবশ্যই; যদিও তাদের সম্ভাবনা লুকানো থাকে মানুষের অস্তিত্বের নিত্য-স্বরূপের গভীরেই। তাই কবির কারবার যা নিয়ে, তা একই সঙ্গে কালের প্রতিভাত আবার কালোত্তীর্ণ। দুইদিক থেকে তাঁকে চালিয়ে যেতে হয় অবিরাম। [মান্নান (সম্পা.) : ২০০৭ : ৫৭]

কালচিহ্নিত জীবনে সময়কে ব্যবহার করে মানুষ অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে, সময়কে অর্থপূর্ণ করে তোলে। কবি কবিতার মাধ্যমে এ কাজ করে। কারণ 'কবিতা তার নিজেকে ব্যক্তি ও উত্তরব্যক্তি সত্তাকে প্রকাশ করবার একটা দিক মহৎ দিক' (দাশ, ২০১১ : ২২)। কবির চেতনার ভেতর দিয়ে সময় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবিতার আশ্রয়ে তিনি নিজেকে যেমন প্রকাশ করেন তেমনি তাঁর সময়কে মূর্ত করেন আর সময়কে মূর্ত করার অনিবার্য প্রক্রিয়ায় কবিতায় স্থান পায় বিশ্বসভ্যতার নানামুখী দিক। সময় ও পৃথিবী কবির অভিজ্ঞতার আধার। ঐতিহ্য, সময়, সমাজ ও সভ্যতা থেকে তিনি সঞ্চয় করেন তাঁর অভিজ্ঞান। কবি পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল হন তাঁর সৃষ্টিশীলতার দ্বারা। তিনি সক্রিয় হন তাঁর অভিজ্ঞতার বিপুল সমারোহের সমাবেশে। গোপাল হালদারের ভাবনায় :

> প্রকৃতি, প্রাণ আর মন–এই তিনের পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যে কোন কালের জীবন এক ত্রিবেণী তীর্থ, তাহার জীবনবোধও জটিল ও বিচিত্র। তফাৎ এই, সেই তীর্থ স্থাণু নয়, প্রবহমান। তাই এই ত্রিধারার দ্বন্দ্বে সমন্বয়ে মানুষের জীবনধারা অগ্রসর হইয়া চলে; কালে কালে নূতন নূতন লোকে গিয়া পৌঁছায়। (গোপাল, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ : ১৬৬)

সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় বোধের জটিল ভাষ্য নির্মিত হয়। তাঁর বিশ্ববীক্ষা ও মননের সমন্বয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন সভ্যতার ভয়াবহ নেতিবাচকতাকে। অশ্বারোহীর নিকট তিনি সভ্যতার কলঙ্কিত দিকসমূহকে অতিক্রম করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন :

> কলঙ্ক অতিক্রমের চেষ্টা আমাদের। স্মৃতিফলক প্রতি দরজায়; এই দেশ অতিক্রম করছে সেই ভয়াবহ ঋতু। কান্না আর ক্রোধ...বহু ধর্ষিতার জঘনের চিহ্ন এই হাতে; একটি পতঙ্গ হত্যায় স্তব্ধ চাতুর্যের কররেখা, এই হাতে! ('এক অশ্বারোহীর গান' : *তিন পাপড়ির ফুল*)

দেশকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড দ্বারা ভাগ না করে পৃথিবীরূপে কল্পনা করা যায়, তা একটি ভয়াবহ দুর্যোগপূর্ণ সময় অতিক্রমের চেষ্টায় রত। সাতের দশকের শেষ প্রান্তে রচিত 'এক অশ্বারোহীর গান' কবিতা। বিশ্বরাজনীতির অপনীতি ও আগ্রাসী সংক্রামকের শিকার গোটা বিশ্ব। স্নায়ুযুদ্ধের তখনো অবসান ঘটেনি। দেশে দেশে গণহত্যা, ধর্ষণ, নিপীড়নের চূড়ান্ত সীমারেখা পেরিয়ে যাওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা চলে, পাশাপাশি প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্ষমতার লীলালাস্যে উন্মত্ত স্বৈরশাসক, মানবিকতা ও গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়ে শক্তিসঞ্চার করে। কবি এই শতাব্দীর, এই সভ্যতার, এই সময়ের ফসল। তিনি সময়ের পতন থেকে নিজেকে দায়বদ্ধহীন করে সরিয়ে রাখতে ব্যর্থ। ধর্ষিতার জঘনের চিহ্ন যেন তাঁর হাতে লেগে থাকে, কান্না আর ক্রোধের অবিরাম চিৎকারধ্বনি তাঁর বোধে আঘাত করে। তিনি জানেন, যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর বারান্দার পাশে হায়েনার চিৎকার ধ্বনিত হবে, জানালার নিচে রক্তস্রাব প্রবাহিত হবে। তিনি এর প্রতিবাদ করেন উদারনৈতিক ভঙ্গিতে। পৃথিবীর রক্তাক্ত হাতের অহংকার ধুয়ে ফেলবেন তিনি সাবানের জলে। শতাব্দীর প্রবাহে যে দুটি বিন্দুর সীমায় তাঁর জীবন– জন্ম আর মৃত্যু– এর মাঝখানে যতটুকু সময় তাঁর নিকট থাকবে সেই সীমিত পরিসরেই তিনি ভালোবাসা বিলিয়ে যাবেন। কবিতার উদ্ধৃতি :

> শতাব্দীর রূপকে একটি মুহূর্তের জন্ম আর মৃত্যু। কিন্তু জরায়ুর কাছে প্রার্থনারত সন্তানের মতো, এই ফেনিল ভালোবাসা আমার তৃষিত আত্মার স্বপ্ন। ('এক অশ্বারোহীর গান' : *তিন পাপড়ির ফুল*)

পৃথিবীতে চোখ মেললেই কবির দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় ধু ধু অট্টালিকার পাশে পাঁজরের হাড়, নর্দমার গূঢ় জল, গলির মুখে খিস্তি, র‍্যালা, ক্বাথ, মল, ক্ষতে উপবিষ্ট মাছি; দেশের গ্রাম ও নগরকে তাঁর স্বাভাবিক সমতল মনে হয় না, বিকলাঙ্গ মনে হয় ('ভ্রমণে যাইনি চৌকাঠ পেরিয়ে' : *পারাবত এই প্রাচীরের শেষ কবিতা*)। প্রাণহীন মফস্বলে বসে তিনি স্মৃতিচারণা করেন শীতের দুপুরের কোনো আঙিনার, যার পাশে কপিক্ষেত; তাঁর ঘুম না আসা চোখে ভেসে যেত জ্যোৎস্নার বেনো জলে ('এক প্রেমিকের স্বপ্ন' : *পারাবত এই প্রাচীরের শেষ কবিতা*)। শান্ত স্নিগ্ধ স্মৃতি তাঁর চেতনালোককে মগ্ন করলেও তা শাসন করে না; হতাশা, মৃত্যু আর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ যা প্রতিটি বর্তমানে ঘটতে ঘটতে অতীত হয়ে যায়, তা তাঁর চেতনালোকে জাগ্রত থাকে, স্মৃতিলোককে নিয়ন্ত্রণ করে। স্মৃতিলোক তাঁর কবিতার বিষয়রূপে উঠে আসে। কারণ কবির প্রতিভাশক্তির মধ্যে স্মৃতির ভূমিকা বিশাল। কবির স্মৃতি কখনো পুরাতন হয় না। কবির মন নিরাতীতের। কবি রোমন্থনে আবিষ্ট হয়ে ফিরিয়ে আনেন নতুনের আমেজ। স্মৃতিকে বলা যায় কবির আরেক বড়ো শক্তি। কারণ কল্পনা বা পূর্বঅভিজ্ঞতা স্মৃতি রোমন্থনেরই একটি পর্যায়। যুগে যুগে মহৎ কবিদের জীবনে দেখা যায় এমন সব অভিজ্ঞতা যা স্মৃতির আধারে ঠাসা। কবি তাঁর সৃষ্টিপ্রেরণার পিঠে চড়ে রোমন্থনে ওই হারানো মুহূর্তগুলো আবার প্রাণবন্ত করে তোলেন কবিতার শব্দে। শব্দকল্পে তিনি মানুষের প্রত্যাবর্তনকে মূর্ত করেন। বিপুল গণহত্যা, ধ্বংসসহ সভ্যতার মুখোশকে তিনি প্রতিনিয়ত উন্মোচন করলেও শেষ পর্যন্ত মানুষের অপরাজেয় শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। জীবন, শতাব্দী, পৃথিবী তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে পরস্পরের সহযোগে পূর্ণ বৃত্ত তৈরি করবে বলে প্রত্যাশা করেন। কবির ভাবনায় :

> কিন্তু মানুষ ঘুরে ঘুরে আসবে। এই মঞ্চ, কান্না আর অভিসম্পাতে তৈরি; সংলাপ শেষ হয়নি, ক্রোধ খুব সংক্ষিপ্ত; ভিন্ন পোশাক পরে আরেক দৃশ্যে উপস্থিত হবো আমরা! কিন্তু সেই অভিবাদন, সেই শুভেচ্ছা বিনিময়, আর প্রিয় মুখের পাশে নতুন জটলা; নারী কিংবা পুরুষ, চিবুকে থাকবে একই চিহ্ন– দুর্বার প্রচেষ্টার কত না অজস্র পথ। ...কেমন করে তাকে মুছবে?... ('এক অশ্বারোহীর গান' : *তিন পাপড়ির ফুল*)

কবির জগৎস্থিত সত্তা কিংবা সার্বিক সত্তা যা সময়ের অভিঘাতে দীর্ণ তা অস্তিত্বরক্ষার মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি সার্বিক সত্তাকে বিশ্বপরিমণ্ডলের সঙ্গে চলমানভাবে চিন্তা করেন। পৃথিবীতে অজস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়েও মানুষের ঘুরে ঘুরে আসার মাধ্যমে কবিসত্তার পুনর্জন্ম হয়।

৬.

কবির বোধ, উপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে সত্তার সংঘাত-সংঘর্ষ-স্বরূপ, সংকট ও জটিলতা কবিতার শব্দবন্ধে স্থান পায়। কবির আত্মগত নিঃসঙ্গতা, অন্তচারী অনুভববেদ্য আত্মসত্তার ভাবানুষঙ্গে কবিতার ভাষা নির্মাণ করেন তা, যা নিজেই নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্বমুখর সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রতিমুহূর্তে ব্যক্তির আত্মসত্তার পরিবর্তন ঘটে, কারণ আত্মসত্তা অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট। ফলে ব্যক্তিমানস এক ধরনের হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয় এবং সে প্রতিমুহূর্তে এ

পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে চায়। তার জগতস্থিত সত্তা উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে অবস্থান করে ভবিষ্যতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রয়াসী হয়। এই সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে তাঁর অস্তিত্ব চিহ্নিত হয়; অবশ্য এ অস্তিত্ব-অভীপ্সার নেপথ্যে জগৎসৃষ্ট নানা সংকট বিদ্যমান। শতাব্দীর সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্ঘটনা কবির সংবেদনশীল মানসে বিরূপ প্রভাব ফেলে। আত্ম-অভিমানী কবি রক্তাক্ত হৃদয়ে বহির্বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে কবিতায় আত্মপ্রীতি ও আত্মরতির নৈবেদ্য সাজান এবং যা তাঁর সংকটকে তীব্রতর করে।

টীকা

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দ দাশের কবিমানস ও কাব্যবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে 'আত্মঅস্মিতা' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

২. সত্তা সম্পর্কিত আলোচনায় দার্শনিকদের স্বতন্ত্র মতামত ব্যক্ত হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে 'সত্তা' বলতে মার্টিন হাইডেগার বর্ণিত 'being' কে বোঝানো হয়েছে। হাইডেগার তাঁর *Being and Time* গ্রন্থে বলেন, 'Being is the self-evident concept, "Being" is used in all knowing and predicating in every relation to being and in every relation to oneself, and the expression is understandable "without further ado". The fact that we live already in an understanding of being and that the meaning of being is at the same time shrouded in darkness proves the fundamental necessity of repeating the question of the meaning of "being".' (Heidegger : 1996 : 3)

৩. সঙ্গলিপ্সা মানুষের খুব নৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্য। এই লিপ্সাই প্রায় বেঁচে থাকা। এই লিপ্সার অনুপস্থিতি মৃত্যু। প্রায়শ আশপাশের মানুষজনকে বলতে শুনি 'কথা বলার মানুষ নেই'। কিংবা 'মন খুলে কথা বলার জন্যও তো কাউকে দরকার'। পারিবারিক, বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে তো বলা হয়ই, সাধারণভাবে যাকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বলা হয়ে থাকে তার মধ্যেও আকছার এই বেদনাবিধুর আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্ত হতে থাকে। তাহলে বলাবলির সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, লিপ্সার সম্বন্ধটি কি? ভাষালীলার বাইরে আদৌ কি লিপ্সা অস্তিত্বমান? কথা বলার জন্য আপনি 'কাউকে' খুঁজছেন, এখানে 'কেউ'টি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোন আপনার কথা বলবার আকাঙ্ক্ষাটিই কি আরও প্রাথমিক, আরও নিয়ামক নয়? তাহলে আপনি এখানে কারণ, 'কেউ'টি উপলক্ষ বা উছিলা, একটু সরল হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও বলা যায় এরকম অজস্র উছিলার সামনে অস্তিত্বমান থাকেন একেকজন মানুষ। তাঁর সেই নিজের অস্তিত্বমানই এখানে মুখ্য। তিনি অন্যের সঙ্গে ভাষালীলা সম্পর্কিত হন তাঁর নিজেরই কারণে। কাঙ্ক্ষা এখানে খোদ তিনি নিজেই। [নিউটন (সম্পা.) : ২০১৫ : ৭০]

৪. রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

ক. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;
খ. কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমান বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;
গ. যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং
ঘ. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার। [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি), পনেরো নম্বর অনুচ্ছেদ]

সহায়কপঞ্জি

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১০)। *প্রবন্ধসংগ্রহ ১*। অনন্যা, ঢাকা।
আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবুল হাসনাত *সম্পা.* (২০০৭)। *জীবনানন্দ দাশ : জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ*। অবসর, ঢাকা।
আহমদ রফিক (২০০১)। *কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*। অনন্যা, ঢাকা।
গোপাল হালদার (১৪১৯ বঙ্গাব্দ)। *সংস্কৃতির রূপান্তর*। প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা।
জীবনানন্দ দাশ (২০১১)। *কবিতার কথা*। বিভাস, ঢাকা।
বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। *শামসুর রাহমানের কবিতা অভিজ্ঞতা ও সংবেদ*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
মিনার মনসুর *সম্পা.* (২০১৫)। *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র ১*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
মিনার মনসুর *সম্পা.* (২০১৫)। *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র ২*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০১৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি (১৯৭১-২০১১)*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
সাজ্জাদ আরেফিন *সম্পা.* (২০১৩)। *নান্দীপাঠ*। সংখ্যা : চার।
সেলিম রেজা নিউটন *সম্পা.* (২০১৫)। *অভ্যাসের অন্ধকার*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
সৈয়দ আলী আহসান (১৯৭০)। *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*। গতিধারা, ঢাকা।
Martin Heidegger (1996). *Being and Time*. State University of New York Press, New York.